সূরা আল্ ফাতেহা-১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে এ সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কায় অবতীর্ণ হয় আর প্রথম থেকেই এটা নামাযের অংশ ছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা হিজ্‌রের আয়াত 'এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে সাতটি বার বার আবৃত্ত আয়াত ও মহান কুরআন দান করেছি' (১৫ঃ৮৮) সূরা আল্ ফাতেহার প্রতিই ইঙ্গিত করে। সূরাটি যে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এ সম্পর্কে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর ঐক্যমত সত্ত্বেও কোন কোন ব্যক্তি এটা পুনরায় মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এটা ঠিক, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত পাওয়ার গোড়ার দিকেই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

সূরাটির বিভিন্ন নাম এবং সেসব নামের তাৎপর্য

'ফাতেহাতুল কিতাব' বা '(ঐশী) কিতাবের উদ্বোধনী সূরা' এ শিরোনামেই এটা সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং এ নামকরণের ভিত্তি বিশ্বস্ত হাদীস বিশারদদের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান (তিরমিযী এবং মুসলিম)। শিরোনামটি পরে 'সূরা ফাতেহা' বা শুধু 'ফাতেহা' হিসেবে সংক্ষিপ্তরূপ লাভ করেছে। এ সূরার আরো অনেক নাম আছে। তার মধ্যে ১০টি অধিক প্রমাণসিদ্ধ-যেমন, আল্ ফাতেহা, আস্ সালাত, আল্ হাম্‌দ, উম্মুল্ কুরআন, আল্ কুরআনুল আযীম, আস্ সাব্‌উল মাসানী, উম্মুল কিতাব, আশ্ শিফা, আর্ রুক্‌ইয়া এবং আল্ কান্‌য। এ সব প্রতিটি নাম সূরার অন্তর্নিহিত বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশ করে।

'ফাতেহাতুল কিতাব' এ অর্থ প্রকাশ করে, পবিত্র কুরআনের শুরুতেই এর অবস্থান হওয়ায় সূরাটি সমগ্র কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুর একটি চাবিস্বরূপ। 'আস্ সালাত' (নামায) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সূরাটি এক সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা এবং এটা ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। 'আল্ হাম্‌দ' (প্রশংসা) দ্বারা মানব সৃষ্টির মহোত্তম উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক মূলত আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহেরই যে একটি দিক্ এতে এ শিক্ষাও রয়েছে। 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, এটা সমগ্র কুরআন শরীফের সার-সংক্ষেপ, যাতে সংক্ষিপ্তাকারে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিক্ষা বিদ্যমান। 'আল্ কুরআনুল আযীম' (মহান কুরআন) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদিও এটা 'উম্মুল কিতাব' ও 'উম্মুল কুরআন' তবুও এ সূরা পবিত্র কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একে কুরআন থেকে আলাদা মনে করা ভুল। 'আস্ সাব্‌উল মাসানী' (সাতটি বার বার আবৃত্ত আয়াত) দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, এ সূরার সাতটি ছোট আয়াত প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম। এ সূরা এ দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে নামাযের প্রত্যেক রাকাআতেই এ সূরা পড়তে হয়। 'উম্মুল কিতাব' (কিতাব-জননী) নামে এদিকে আলোকপাত করা হয়েছে, এ সূরার অন্তর্নিহিত প্রার্থনার ফল হিসেবেই কুরআনী শরীয়ত বা বিধান-গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। 'আশ্ শিফা' (আরোগ্য) দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এর মধ্যে মানুষের সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাব এবং বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসা রয়েছে। 'আর্ রুক্‌ইয়া' (রক্ষাকবচ) দ্বারা বুঝানো হয়েছে, শুধুমাত্র এটা রোগমুক্ত করার সূরাই নয়, বরং এটা শয়তান ও তার অনুসারীদের আক্রমণ থেকেও মানুষকে রক্ষা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়কে শক্তিশালী করে। 'আল্ কান্‌য' (ভান্ডার) দ্বারা বলা হয়েছে, এ সূরা হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক ফুরন্ত ভান্ডার।

বাইবেলের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে ফাতেহার উল্লেখ

'সূরা ফাতেহা' নামেই এ সূরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাইবেলের নূতন নিয়মের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে এ 'ফাতেহা' নামের উল্লেখ আছে–"আমি এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে একখানা ক্ষুদ্র উন্মুক্ত পুস্তিকা (ফতুহা) ছিল। তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রে ও বাম চরণ স্থলে রাখিলেন" (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ১-২)। এ বাক্যে 'উন্মুক্ত' বুঝাতে হিব্রু শব্দ 'ফতুহা' ব্যবহৃত হয়েছে যা আরবী শব্দ 'ফাতেহা'র অনুরূপ। 'আর তিনি (শক্তিমান দূত) চীৎকার করিলে সপ্ত বজ্র নিজ নিজ স্বর ধ্বনিত করিল' (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ৩-৪)। এই 'সপ্ত বজ্রধ্বনিই' হচ্ছে সাত আয়াত সম্বলিত সূরা ফাতেহা। খৃষ্টান পন্ডিতগণ বলেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে সম্পর্কিত এবং এর সত্যতা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ), যাঁর মাধ্যমে যীশুখৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, তিনি এ সূরার বিস্তারিত গভীর ব্যাখ্যা লিখে গেছেন এর আলোকে তাঁর দাবীর সত্যতাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একে সর্বদা এক আদর্শ দোয়া হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি এ সূরার সাতটি ছোট আয়াত থেকে ঐশী শিক্ষার এমন সব নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন যা পূর্বে বিশ্ববাসীর অগোচরে ছিল। বলা যায়, এ সূরাটির ব্যাখ্যা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক যথার্থ অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বে যেন এর ভান্ডার রুদ্ধ ছিল। এভাবে নূতন নিয়মের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীও (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ৪) পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন, 'আর সপ্ত মেঘধ্বনি হইলে আমি লিখিতে উদ্যত হইলাম এবং (তখন) স্বর্গ হইতে এ বাণী শুনিলাম, আমাকে বলা হইল ঃ ঐ সপ্ত বজ্রধ্বনি যাহা বলিল, তাহা মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখ এবং লিখিও না .....'। এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে, 'ফতুহা' বা সূরা 'ফাতেহার' নিগূঢ় তত্ত্বাবলী কিছুকালের জন্য অনুদ্‌ঘাটিত থাকবে, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভান্ডার উদ্‌ঘাটিত

হবে। বর্তমান যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক এ মহান কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে।

কুরআনের পরবর্তী অংশের সাথে সম্পর্ক

সূরা ফাতেহা প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনের ভূমিকাস্বরূপ। এ যেন এক ক্ষুদ্রাকৃতি কুরআন। তাই শুরুতেই এর মাধ্যমে পাঠক মোটামুটিভাবে সমগ্র কুরআনের স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর একটি পরিচিতি বা ধারণা লাভ করতে পারেন। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সূরা ফাতেহা কুরআন শরীফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (বুখারী)।

বিষয়বস্তু

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার নির্যাস 'সূরা ফাতেহা'। তাই বিশদভাবে সমগ্র কুরআনে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার সূরা ফাতেহায় সন্নিবেশিত হয়েছে। শুরুতেই এ সূরায় আল্লাহ্ তাআলার মৌলিক গুণাবলীর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে কেন্দ্র করে তাঁর অন্যান্য গুণাবলী আবর্তিত হচ্ছে এবং এগুলোর ওপরই বিশ্বজগতের পরিচালনার ভিত্তি এবং স্রষ্টা ও বান্দার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তাআলার চারটি মৌলিক গুণ যেমন, রব্ব, (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, ক্রমবিকাশদাতা এবং পূর্ণতাদাতা), 'রহমান' (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী), 'রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এবং 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক) দিয়ে বুঝানো হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির পর তার প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তাআলা শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ নিহিত রেখেছেন এবং মানুষের শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন। তদুপরি মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কর্মকান্ড যাতে শুভ ফলদায়ক হয় তিনি তারও ব্যবস্থা করেছেন। এ সূরাতে আরো বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার 'ইবাদত' অর্থাৎ তাঁর উপাসনার জন্যই মানুষের সৃষ্টি এবং এজন্য সব সময় তাকে আল্লাহ্র ইবাদত, আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জন করতে হবে এবং এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময় আল্লাহ্রই সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার উক্ত মৌলিক গুণাবলী বর্ণনার পর সূরাটিতে পূর্ণ আত্মবিলীনতাসহ বান্দা কর্তৃক এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বব্যাপী প্রার্থনা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রার্থনা বা ইবাদতের আসল শিক্ষা হলো, মানুষ যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করে যার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য জরুরী উপকরণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু অতীতের উৎকৃষ্ট নমুনা ও আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে, বিশেষত তাঁদের, যাঁরা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছিলেন, সেহেতু মানুষকে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়াও চাইতে শিখানো হয়েছে যেন তাঁদের অনুরূপ তাকেও অসীম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সফলতার পথে পরিচালিত করা হয়। পরিশেষে সূরাটিতে এক ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণীসহ বলা হয়েছে, মানুষ সৎপথ পাওয়ার পর যেন পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয় এবং তার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সৃষ্টিকর্তা হতে দূরে সরে না যায়। বরং সে যেন অবিরাম আল্লাহ্র সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করে সম্ভাব্য যে কোন পদস্খলন থেকে আত্মরক্ষা করে। এটাই সূরা ফাতেহার সার সংক্ষেপ এবং এ বিষয়বস্তুকেই বিশদভাবে পাঠকদের হেদায়াতের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উপমা দিয়ে কুরআনের অন্যান্য সূরা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মু'মিনদের আদেশ দেয়া হয়েছে, পবিত্র কুরআন পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে তারা যেন শয়তানের কবল থেকে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে। যেমন, 'যখন তুমি কুরআন পড় তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর' (১৬ঃ৯৯)। আশ্রয় প্রার্থনা কয়েকটি কারণে হতে পারেঃ (১) এজন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা যেতে পারে যাতে কোন অমঙ্গল স্পর্শ না করে, (২) এ লক্ষ্যে আশ্রয় চাওয়া যেতে পারে যাতে কোন মঙ্গল আমাদের হস্তচ্যুত না হয় এবং (৩) আশ্রয় চাওয়ার উদ্দেশ্য এও হতে পারে, একবার কল্যাণ লাভের পর আমরা যেন তা থেকে বঞ্চিত না হই। এজন্য নির্ধারিত দোয়া হলো,"আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম" 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি' এবং এ দোয়া কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

এ সূরা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায় এবং সমস্ত কুরআনে এমন ১১৪টি অধ্যায় আছে, যার প্রত্যেকটিকে এক একটি সূরা বলা হয়। 'সূরা' কথাটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন (১) উচ্চপদ ও মর্যাদা, (২) একটি চিহ্ন বা নিদর্শন, (৩) একটি সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদ এবং (৪) এমন কিছু যা সর্বাঙ্গীন এবং সম্পূর্ণ (আকরাব এবং কুরতুবী)। কুরআন করীমের অধ্যায়গুলোকে এ জন্যেও সূরা বলা হয়, (ক) তা পাঠের মাধ্যমে পাঠক মর্যাদার ভূষণে ভূষিত হয় এবং এর ফলে সে খ্যাতি লাভ করে, (খ) এগুলো পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে শুরু ও শেষ চিহ্ন বা নিদর্শন হিসেবে কাজ করে, (গ) এদের প্রত্যেকটিই আধ্যাত্মিক মর্যাদার দিক থেকে এক একটি সুউচ্চ প্রাসাদ বিশেষ এবং (ঘ) মূলভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো সর্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ। কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানেও এ ধরনের অধ্যায়কে সূরা নামে অভিহিত করা হয়েছে (২ঃ২৪, এবং ২৪ঃ২)। হাদীসেও এটি ব্যবহার হয়েছে যেমন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, এখনই আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে (মুসলিম)। এ সমস্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ কথা সুস্পষ্ট, কুরআনের এক একটি বিভাগ হিসেবে 'সূরা' শব্দের ব্যবহার ইসলামের আদি থেকেই প্রচলিত ছিল এবং এটা পরবর্তীকালের কোন নূতন সংযোজন নয়।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سَبْعُ اٰيَاتٍ

সূরা আল্ ফাতেহা -১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৭ আয়াত ও ১ রুকূ

১। [ক]আল্লাহ্‌র[১] [খ]নামে[৩], যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী[৪]।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

দেখুন ঃ ক. প্রতিটি সূরার শুরুতে কেবল ৯ নং সূরা ছাড়া; এবং ২৭ঃ৩১; ৯৬ঃ২ দ্রষ্টব্য।

১। 'আল্লাহ্' সেই পরম অস্তিত্বের বা সত্তার নাম, যিনি পূর্ণতম গুণাবলীর একমাত্র অধিকারী এবং ধারণাতীতভাবে ত্রুটিমুক্ত। আরবী ভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দটি অন্য কোন সত্তা বা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়না। অন্য কোন ভাষাতেই সেই উচ্চতম সত্তার এরূপ স্বতন্ত্র নামবাচক কোন বিশেষ্য পদ নেই। অন্যান্য ভাষায় যে নামগুলো আছে সেগুলোর সবই গুণবাচক। সেগুলো বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'আল্লাহ্' শব্দটি কখনো বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না। 'আল্লাহ্' একটি মৌলিক বিশেষ্য। এটা অন্য কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়নি এবং কোন গুণ-প্রকাশক বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয় না। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ পন্ডিতেরা এ অভিমতকে সমর্থন করেন। সর্বাপেক্ষা নির্ভুল অভিমত হলো, 'আল্লাহ্' নামবাচক বিশেষ্য। একমাত্র সে সত্তারই নাম যিনি নিজে নিজেই অস্তিত্ববান, স্বনির্ভর, সর্বগুণাধার। 'আল্লাহ্' শব্দের 'আল্' অবিভাজ্য। এটি 'আল্লাহ্' শব্দেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ (মুফরাদাত, আকরাব ও লেইন)।
২। 'ইস্‌ম' অর্থ নাম বা গুণ (আক্‌রাব)। এখানে উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং সৃষ্টিকর্তার মূল নাম 'আল্লাহ্' এর সঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র গুণ 'আর্ রহমান' (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী) ও 'আর্ রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এর সাথেও ব্যবহৃত হয়েছে।
৩। আরবী ভাষায় 'বা' অব্যয়টি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এখানে 'সাথে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বা'+'ইস্‌ম' মিলে গঠিত যুগ্ম শব্দ 'বিস্‌মি', যার অর্থ 'নামের সাথে'। আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী 'বিস্‌মিল্লাহ্' কথাটির পূর্বে কিছু কথা উহ্য রয়েছে-যেমন 'ইক্‌রা' (পড়), 'আকরাউ' (আমি পড়ি), 'নাকরাউ' (আমরা পড়ি) কিংবা 'ইশরা' (শুরু কর), 'আশরাউ' (আমি শুরু করি), 'নাশরাউ' (আমরা শুরু করি)। অতএব উহ্য শব্দগুলোকে নিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহ্'র অর্থ 'আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি বা পাঠ করছি', যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী এবং পুনঃ পুনঃ দয়া প্রদার্শনকারী, বার বার রহমকারী, বার বার কৃপাকারী' (বাহ্‌রে মুহীত, ফাত্‌হুল বায়ান)।
৪। 'আর্ রহমান (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী) এবং 'আর্ রহীম' (বার বার কৃপাকারী) এ উভয় শব্দ একই 'রহ্‌ম' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রাহেমা' অর্থ সে দয়া প্রদর্শন করলো, সে ক্ষমা করলো। 'রহমত' শব্দের মধ্যে দুটি ভাব আছে ঃ একটি 'রিক্‌কাত' দয়ার্দ্রতা ও কোমলতার ভাব, অপরটি 'ইহ্‌সান' বা পরোপকারের ভাব (মুফ্‌রাদাত)। 'আর্ রহমান' শব্দটি আরবী 'ফা'লান' ওজনে গঠিত এবং 'আর্ রহীম' শব্দটি 'ফায়িল' ওজনে। আরবী ভাষার নিয়ম হলো, মূল শব্দের সাথে যতবেশি অক্ষর যুক্ত হবে, ততই এর অর্থের ব্যাপকতা বা গভীরতা বৃদ্ধি পাবে (কাশ্‌শাফ)। 'ফা'লান' ওজনের শব্দে পূর্ণতা ও ব্যাপকতা থাকে এবং 'ফায়িল' ওজনের শব্দে ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা ও বদান্যতা প্রকাশ পায় (মুহীত)। অতএব এ হিসেবে 'আর্ রহমান' দিয়ে সারাবিশ্ব পরিবেষ্টনকারী দয়া বুঝায় এবং 'আর রহীম' দিয়ে সেই দয়াকে বুঝায় যা সীমিত হলেও বার বার প্রদর্শিত হয়। উপরোক্ত অর্থের আলোকে 'আর্ রহমান' এমন সত্তাকে বুঝায় যিনি অযাচিতভাবে ও ব্যাপকভাবে কারো সাধনা বা কর্মের সাথে সম্পর্কশূন্যরূপে সকল সৃষ্টির প্রতিই সমভাবে কৃপা বর্ষণ করে থাকেন এবং 'আর রহীম' দিয়ে ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি মানুষের কাজের বিনিময়ে সৎকাজের পুরস্কারস্বরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে থাকেন এবং বদান্যতার সাথে বার বার দেখিয়ে থাকেন। 'আর রহমান' শব্দটি কেবল আল্লাহ্‌র জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু 'রহীম' শব্দটি দয়ালু মানুষের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। 'আর রহমান' শব্দটি অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী নির্বিশেষে সব মানবকেই শুধু নয়, বরং সারা বিশ্বের সব সৃষ্টিকেই স্বীয় আওতাভুক্ত করে। কিন্তু 'রহীম' শব্দটি প্রধানত বিশ্বাসীগণকে আওতাভুক্ত করে। মহানবী (সাঃ) এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলার 'আর্ রহমান' গুণটির প্রকাশ সাধারণভাবে ইহকালের (নেয়ামতসমূহের) সাথে সম্পৃক্ত এবং 'আর রহীম' গুণটির প্রকাশ পরকালের (নেয়ামতসমূহের) সাথে সম্পৃক্ত (মুহিত)। এ দিয়ে বুঝা যায়, যেহেতু এ বিশ্ব (অর্থাৎ ইহকাল) মানুষের জন্য এক বিরাট কর্মক্ষেত্র এবং পরকাল তার কর্মের ফল বিশেষভাবে পাওয়ার জায়গা, সেহেতু 'আর্ রহমান'রূপে আল্লাহ্ মানুষের কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী সব বস্তু

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২। সব [৫] প্রশংসা[৫-ক] আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্বজগতের[৬] প্রভু-প্রতিপালক,[৬ক] اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ২,৪৬; ১০ঃ১১; ১৮ঃ২; ২৯ঃ৬৪; ৩০ঃ১৯; ৩১ঃ২৬; ৩৪ঃ২; ৩৫ঃ২, ৩৭ঃ১৮৩; ৩৯ঃ৭৬; ৪৫ঃ৩৭।

ইহজগতে সরবরাহ করেন এবং 'আর্ রহীম' রূপে পরকালে ফল পাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। যা কিছু আমাদের প্রয়োজন এবং যা কিছু আমাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক তার সবই বিনা পরিশ্রমে, বিনা যোগ্যতায় ও বিনা চাওয়ায় আমাদের জন্মের পূর্ব থেকেই ঐশী অনুগ্রহরূপে আমাদের জন্য মজুদ থাকে। তবে পরকালে যেসব ঐশী আশীর্বাদ মজুদ রয়েছে তা ইহকালীন কাজের পুরস্কাররূপে আমাদেরকে যার যার যোগ্যতানুসারে দেয়া হবে।

এ দিয়ে বুঝা যায়, 'আর্ রহমান' হলেন সেই মহান দাতা যিনি আমাদের জন্মের পূর্বেই আমাদের জন্য সবই দিয়ে রেখেছেন, 'আর্ রহীম' হলেন সেই কল্যাণবর্ষণকারী যিনি কাজের বিনিময়ে পুরস্কার দান করেন।

'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' সূরা তওবা বা বারাআত ছাড়া কুরআনের প্রতিটি সূরার (অধ্যায়ের) প্রথম আয়াত। তবে সূরা 'বারাআত' সূরা 'আনফালের'-ই বর্ধিত অংশবিশেষ, স্বাধীন ও পৃথক সূরা নয়। ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখনই কোন নূতন সূরা অবতীর্ণ হতো তখনই 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতটি প্রথমে অবতীর্ণ হতো। বিস্‌মিল্লাহ্ না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতে পারতেন না নূতন সূরা আরম্ভ হয়েছে (দাউদ)। এথেকে বুঝা যায় (১) 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' আয়াতটি কুরআনেরই অংশ, অতিরিক্ত কিছু নয়, (২) সূরা 'বারাআত' স্বাধীন সূরা নয়। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সেইসব লোকের ধারণাকে খন্ডন করে যারা বলেন, 'বিস্‌মিল্লাহ্' কেবল সূরা ফাতিহার অংশ। অন্যান্য সূরার শুরুতেও 'বিস্‌মিল্লাহ্' ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে ঃ কুরআন ঐশী জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সেই জ্ঞানের ধারে কাছে পৌঁছানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 'পবিত্রকৃত ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না' (৫৬ঃ৮০)। সেই কারণেই প্রতিটি সূরার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' সংযুক্ত করে মুসলমানদের স্মরণ করানো হয়েছে, কুরআনের ঐশী জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ করতে হলে এবং এথেকে প্রকৃত উপকার পেতে হলে তাদেরকে কেবল পবিত্র হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হলেই চলবে না, বরং পদে পদে অতিশয় মিনতির সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য চাইতে হবে। 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতটি আরো একটি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পদন করে । এর মধ্যে প্রত্যেক সূরার অর্থের ও তাৎপর্যের চাবিকাঠি রয়েছে। কেননা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি কোন না কোনভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার মৌলিক গুণ 'রহমানিয়ত' (পরম করুণা, অযাচিত-অসীম দান) বা 'রহীমিয়ত' (বার বার কৃপা করা) এর সাথে সম্পর্কিত। এরূপে প্রত্যেক সূরাই বস্তুত 'বিস্‌মিল্লাহ্' আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার মূল-গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ মাত্র। অনেকে বিতর্ক সৃষ্টির জন্য বলেন, 'বিস্‌মিল্লাহ্' কথাটি সূত্র হিসেবে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ হতে নকল করা হয়েছে। সেল বলেন, এটা 'যেন্দাবেস্তা' হতে অনুকরণ করা হয়েছে। আর প্রাচ্যবিদ রড্‌ওয়েল বলেন, ইসলাম-পূর্ব আরবরা এটা ইহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল এবং পরে তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দুটি অভিমতই স্পষ্টত ভুল। প্রথম কথা হলো, মুসলমানেরা কখনো দাবী করেন না যে যেহেতু এ সূত্রটি কোন না কোন আকারে ইসলাম-পূর্ব আরবেরা কুরআন অবতরণের আগেই কিছুদিন ব্যবহার করেছে, সেহেতু তা ঐশীবাণী হতে পারে না। বস্তুত কুরআনেই উল্লেখ আছে, সুলায়মান (আঃ) সাবার রাণীর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন তা এ 'বিস্‌মিল্লাহ্' দিয়েই আরম্ভ করেছিলেন (২৭ঃ৩১)। মুসলমানেরা যে দাবী করে সে দাবীকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তা হচ্ছে কুরআন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূত্রটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করেছে। পূর্ববর্তী কোনও ধর্মগ্রন্থ এরূপ যথোপযুক্তভাবে এর ব্যবহার করেনি। এ কথা বলাও মারাত্মক ভুল, ইসলাম-পূর্ব আরবরা এ সূত্রটির ব্যবহার সব সময় করতো। কেননা এতো সকলেরই জানা কথা, তারা আল্লাহকে 'আর্ রহমান' নামে আখ্যায়িত করাকে ঘৃণার কাজ মনে করতো। যা হোক, যদি এরূপ সূত্র পূর্বেও প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয় তাতে কুরআনেরই সত্যতা সাব্যস্ত হয়। কারণ কুরআনই বলে, এমন কোন জাতি নেই যাদের মাঝে ঐশী-শিক্ষাদাতা পাঠানো হয়নি (৩৫ঃ২৫)। কুরআন আরো বলে, পূর্বেকার অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর সকল চিরস্থায়ী সত্য ও স্থায়ী শিক্ষামালা কুরআনে একত্র করা হয়েছে (৯৮ঃ৪)। অবশ্য কুরআনে আরো উন্নত শিক্ষা রয়েছে। তবে যা-ই অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হতে পাওয়া গেছে কুরআন সেগুলোকে উন্নতরূপ দিয়েছে এবং অধিক উন্নত পর্যায়ে অভিষিক্ত করে উন্নতভাবে ব্যবহারোপযোগী করেছে।

৫। কোন কিছুকে 'নির্দিষ্ট' করতে আরবীতে 'আল্' ব্যবহৃত হয়, যেরূপ ইংরেজীতে 'দি' বা বাংলাতে 'টি, টা, খানি, খানা' ইত্যাদি শব্দের পূর্বে বা পরে যোগ করে বিষয় বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। 'আল্' দিয়ে বিষয় বা বস্তুর এক ধরনের সবদিকই নির্দেশ করে অথবা এর ব্যাপকতা ও পূর্ণতাকে জ্ঞাপন করে, এর সকল স্তর ও পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। যে বস্তুর কথা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে তার পুনরুল্লেখের ক্ষেত্রেও 'আল্' ব্যবহৃত হয়, কিংবা মনে এর ধারণা উপস্থিত থাকলেও 'আল্' দিয়ে শব্দটিকে বিশেষিত করা হয়েছে।

৫-ক। আরবীতে দুটি শব্দ 'মাদ্‌হ' ও 'হাম্‌দ', প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়। তবে 'মাদ্‌হ' শব্দটি মিথ্যা প্রশংসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু 'হাম্‌দ' শব্দটি একমাত্র সত্য প্রশংসার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া 'মাদ্‌হ' এমন

৫-ক টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৬ ও ৬-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩। [ক] পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও), [খ] বারবার কৃপাকারী[৭], الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣

৪। [গ] বিচার[৮] দিবসের[৯] [ঘ] মালিক।[১০] مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤

দেখুন ঃ ক. ২৫ঃ৬১; ২৬ঃ৬; ৪১ঃ৩; ৫৫ঃ২; ৫৯ঃ২৩; খ. ৩৩ঃ৪৪; ৩৬ঃ৫৯; গ. ৪৮ঃ১৫; ঘ. ৫১ঃ১৩; ৭৪ঃ৪৭; ৮২ঃ১৮; ১৯; ৮৩ঃ৭।

উপকারের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে কর্তার কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নেই। কিন্তু 'হাম্‌দ' শুধু সেসব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে সৎকাজ বা উপকার করা হয় (মুফ্‌রাদাত)। 'হাম্‌দ' শব্দে একদিকে প্রশংসিতের গুণগান, মর্যাদা বৃদ্ধি ও উন্নত মহিমা প্রকাশ পায়, আর অন্যদিকে প্রশংসাকারীর বিনয়, নম্রতা ও অধীনতার মনোভাব নিহিত থাকে। অতএব 'হাম্‌দ' শব্দই এস্থলে সর্বাধিক উপযুক্ত শব্দ, যেখানে আল্লাহ্ তাআলার সত্যিকার গুণাবলী, সত্যিকার মহিমা-কীর্তন, যথোচিত প্রশংসা তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ পরিভাষায় 'হাম্‌দ' শব্দটি এখন শুধু আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পরিভাষাগতভাবে 'হাম্‌দ' মানেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা।

৬। 'আল্ আলামীন', 'আলাম' শব্দের বহুবচন। 'আলাম' শব্দ 'ইল্‌ম' ধাতু থেকে উৎপন্ন, আর 'ইল্‌ম' অর্থ 'জানা'। 'আলাম' শব্দটা এমন জীবজন্তু, গাছপালা ও বস্তুনিচয়কে বুঝায়, যাদের সাহায্যে কেউ সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারে (আকরাব)। এটা কেবল সৃষ্ট জীবজন্তু বা সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে বুঝায় না, বরং তাদের বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাসকেও বুঝাতে পারে। যেমন 'আলামুল্ ইন্‌স্' বলতে বুঝায় মানবজগত, 'আলামুল হায়ওয়ান' বলতে বুঝায় পশুজগত ইত্যাদি। 'আল আমীন' বলতে বুদ্ধিসম্পন্ন মানব ও ফিরিশ্‌তকেই কেবল বুঝায় না, বরং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই বুঝায় (২৬ঃ২৪-২৯ ও ৪১ঃ১০)। কোন কোন সময় এটা সীমিত অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২ঃ১২৩)। এ স্থলে এটা সবচেয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুকেই বুঝিয়েছে, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদিসহ বিশ্বের যাবতীয় প্রাণী ও জড় পদার্থ 'আলামীন' এর অন্তর্ভুক্ত।

'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র' বাক্যটি, 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি' বাক্য থেকে অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর। কারণ মানুষ তার সীমিত জ্ঞানানুযায়ী আল্লাহ্‌কে প্রশংসা করতে পারে। কিন্তু 'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র' এতে মানুষের জ্ঞাত প্রশংসা তো থাকেই, তার অজ্ঞাত-অজানা প্রশংসাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ সব সময় ও সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য, মানুষের অপূর্ণ জ্ঞান বা চেতনায় তা বুঝা যাক বা না যাক, মানুষের উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ুক বা না পড়ুক। সর্বোপরি ব্যাকরণগতভাবে 'আল্ হাম্‌দ' শব্দটি অসমাপিকা ক্রিয়াভাবও প্রকাশ করে। অতএব 'আল্লাহ্' সেই ক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম উভয়ই হতে পারেন। 'কর্তা' হলে অর্থ হবে আল্লাহ্‌ই সত্যিকার প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। আর কর্মকারক হলে অর্থ দাঁড়াবে, সব রকমের সত্য ও পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই প্রাপ্য। 'আল্' এর অর্থ ৫ নং টীকায় দেখুন।

এ আয়াতে বিশ্বের ক্রমোন্নয়ন বা বিবর্তন ধারার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই ক্রমোন্নয়নের ধারায় পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করে। 'রাব্ব' হলেন তিনিই যিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও পর্যায়ক্রমে উন্নতি দান করেন। এতে এ কথাও বুঝা যায়, বিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এখানে যে বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণভাবে প্রচলিত 'বিবর্তনবাদ' (থিওরী অব ইভোলিউশন) নয়। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, সীমাহীন উন্নতির জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কারণ 'রাব্বুল আলামীন' শব্দগুলোতে এ কথা নিহিত রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন। আর এরূপ করা তখনই সম্ভব যখন এক উন্নত স্তরের পরে আরো উন্নত স্তর থাকে এবং এভাবে অন্তহীন স্তর থাকে।

৬-ক। 'রাব্বা' অর্থ সে কর্মসম্পাদন করলো, সে বিষয়টি বা বস্তুটিকে বৃদ্ধি করলো, এর উন্নতি সাধন করে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালো ও পূর্ণ করলো, সে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলো। এভাবে 'রাব্ব্' অর্থা দাঁড়ায়ঃ (ক) প্রভু, মনিব, সৃষ্টিকর্তা, (খ) যে প্রতিপালন করে ও বৃদ্ধি সাধন করে, (গ) যে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা দান করে (মুফরাদাত ও লেইন)। রাব্ব্ শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের সঙ্গে যুগ্মভাবে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ্ ছাড়াও মানুষ কিংবা অন্য কিছুর জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে।

৭। 'আর্ রহমান' ও 'আর্ রহীম' গুণ দুটি সূরা 'ফাতেহা'র অর্থ বুঝতে চাবিকাঠির কাজ করে। এখানে গুণদ্বয়ের পুনরুল্লেখের একটি অতিরিক্ত উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে এগুলো 'রাব্বুল আলামীন' ও 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' গুণদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে।

৮। 'দীন' মানে প্রতিদান, শাস্তি বা পুরস্কার, বিচার বা হিসাবনিকাশ, রাজত্ব বা শাসনকর্তৃত্ব, অনুবর্তিতা, ধর্ম ইত্যাদি (আকরাব, লেইন)। আল্লাহ্ তাআলার চারটি গুণ, যথা 'বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক', 'পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী', 'বার বার কৃপাকারী' এবং 'বিচার দিবসের মালিক'–এ চারটিই হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার মূল বা আদি গুণ। আল্লাহ্ তাআলার অন্যান্য গুণাবলী এ চারটি মূল গুণের ব্যাখ্যা বা শাখাপ্রশাখা মাত্র। অন্য গুণগুলো এ চারটি গুণের বিশ্লেষণকারী। এ চারটি মৌলিক গুণ চারটি

টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ৯ ও ১০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। [ক]আমরা তোমারই ইবাদত[১১] করি এবং [খ]তোমারই সাহায্য[১২] চাই।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥

৬। তুমি আমাদেরকে [গ]সরল সুদৃঢ় পথে[১৩] পরিচালিত কর,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦

দেখুন ঃ ক. ১১ঃ৩; ১২ঃ৪১; ১৬ঃ৩৭; ১৭ঃ২৪; ৪১ঃ৩৮; খ.২ঃ৪৬; ১৫৪, ২১ঃ১৩; গ.১৯ঃ৩৭; ৩৬ঃ৬২; ৪২ঃ৫৩; ৫৪।

স্তম্ভস্বরূপ, যার উপর আল্লাহ্‌র 'আর্‌শ' বা সর্বময় ক্ষমতার আসন স্থাপিত। আল্লাহ্ তাআলা মানুষের কাছে যে ক্রমধারায় নিজ গুণাবলী প্রকাশ করে থাকেন এ সূরাতে সেই ক্রমধারায় এ চারটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক) গুণের তাৎপর্য হলো, মানব সৃষ্টির সাথে সাথে তিনি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাও সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে পারে। এর পরপরই 'আর্ রহমান' গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয় যার মাধ্যমে প্রকৃত পথে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও উপকরণসমূহ দান করেন। আর যখন মানুষ সেই উপায় উপকরণের সদ্ব্যবহার করে তখন 'আর রহীম' গুণটি কার্যকরী হয় এবং তাকে কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। সবশেষে 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক) নামক গুণটি মানুষের পরিশ্রমের শেষ ও সার্বিক ফলাফল প্রকাশিত করে এবং এভাবে প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। যদিও চূড়ান্ত ও পূর্ণ হিসাবনিকাশ পরকালের বিচারের দিনেই সম্পন্ন হবে, তথাপি ইহকালেও প্রতিদান ও প্রতিফল পাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তবে তফাৎ হলো, ইহকালে মানুষের কাজকর্মের বিচার-পুরস্কার বা শাস্তিদান অন্য মানুষের মাধ্যমে, রাজা-বাদশাহ্ কর্তৃক অথবা শাসকদের দ্বারাও সম্পন্ন হয় এবং সেজন্য তাতে ভুলভ্রান্তির আশংকা থাকে। শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাআলার একক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাবে এবং প্রতিফল ও পুরস্কার প্রদান একমাত্র তাঁরই হাতে ন্যস্ত থাকবে। কাজেই সেখানে ভুলভ্রান্তি থাকবে না, অযথা শাস্তি বা অযথা পুরস্কারও থাকবে না। 'মালিক' শব্দটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, তিনি সাধারণ বিচারকের মত নন যিনি সংশ্লিষ্ট আইনের গন্ডীর ভিতরে থেকে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আইনকানুন মোতাবেক বিচার করেন এবং এরূপ করতে তিনি বাধ্য। মালিকের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা যে কোনভাবে, যে কোন স্থানে, যে কোন সময় ক্ষমা করতে পারেন, দয়া দেখাতে পারেন। এখানে 'দীন' শব্দটির অর্থ যদি 'ধর্ম' হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, 'ধর্ম-যুগের প্রভু' যার তাৎপর্য হচ্ছে, যখন ধর্ম অবতীর্ণ হবার সময় আসে তখন মানুষ ঐশী শক্তি ও ঐশী সিদ্ধান্তসমূহের অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পায় এবং ঐশী নিদর্শনসমূহ চতুর্দিকে প্রকাশিত হয়। আবার ধর্মের স্রোতে যখন ভাটা পড়ে তখন মনে হয় এ বিশ্ব লাগামহীন এবং কর্তৃত্বহীন অবস্থায় আপনা-আপনি যন্ত্রের মত চলছে, সৃষ্টিকর্তা বা মালিকের ভূমিকা তখন ততটা চোখে পড়ে না।

৯। 'ইয়াওম' অর্থ অখন্ড-অসীম সময়, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, বর্তমান সময় (আকরাব)।

১০। 'মালিক' অর্থ সর্বময় কর্তা, যার কোন কিছুর উপর স্বত্বাধিকার রয়েছে এবং তিনি তা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন (আকরাব)।

১১। 'ইবাদাহ্' অর্থ চূড়ান্ত বিনয়, পুরোপুরি বশ্যতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও সেবা। আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস ও তা প্রকাশ করাও 'ইবাদাহ্' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এ শব্দটির অন্য একটি তাৎপর্য হলো, কোনবস্তুর 'মোহর' বা ছাপ গ্রহণ করা। এ তাৎপর্য মূলে 'ইবাদাহ্'র অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীর ছাপ নিজের মাঝে গ্রহণ করে তা ধারণ ও বর্দ্ধন করে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করা।

১২। 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' কথাটি, 'তোমারই সাহায্য চাই' বাক্যটির পূর্বে স্থান পেয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলার মহান গুণাবলী অবগত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মাঝে প্রথম যে আবেগটি জেগে ওঠে তা হলো উপাসনার আবেগ। এই প্রথম এ আবেগের পরে পরেই সাহায্য প্রার্থনার আবেগ জাগে। মানুষ আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে চায়, কিন্তু তা করতে গেলে নানাভাবে আল্লাহ্‌রই সাহায্যের প্রয়োজন। এ আয়াতে 'আমরা' (বহুবচন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেঃ (ক) মানুষ পৃথিবীতে একাকী বাস করে না বরং সে সমাজের অংশ হিসেবেই পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে মিলে মিশে বাস করে। অতএব তার একা একা আল্লাহ্‌র পথে চললেই হবে না, বরং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, (খ) যে পর্যন্ত মানুষের পারিপার্শ্বিকতা শুধরানো না হয় সে পর্যন্ত মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে না। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ঃ প্রথম চারটি আয়াতে 'আল্লাহ্‌কে' প্রথম পুরুষ (ব্যাকরণগতভাবে) দেখানো হয়েছে। কিন্তু পঞ্চম আয়াতে এসে হঠাৎ তাঁকে মধ্যম পুরুষে ডাকা হয়েছে। এর কারণ হলো, প্রথম চারটি আয়াতে যে চারটি মহান ঐশী গুণের উল্লেখ হয়েছে সেগুলোর ধ্যান-ধারণা ও প্রভাব মনে প্রবেশ করা মাত্র মানুষের হৃদয় সেই মহামহিম স্রষ্টার দর্শন লাভের জন্য এত তীব্রভাবে ব্যাকুল ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তাঁর

১২ নং টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৩ নং টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ১ [৭] ৭। [ক]তাদের পথে, যাদের তুমি পুরস্কার[১৪] দিয়েছ, [খ]যারা (তোমার) ক্রোধভাজন হয়নি এবং [গ]যারা পথভ্রষ্ট[১৫] হয়নি।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ ع

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৭০; ৫ঃ২১; ১৯ঃ৫৯; খ. ২ঃ৬২, ৯১; ৩ঃ১১৩; ৫ঃ৬১, ৭৯; গ. ৩ঃ৯১; ৫ঃ৭৮; ১৮ঃ১০৫।

উপাসনার বাসনা এতই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে তার হৃদয়ের সেই আকুতিকে চরিতার্থ করার উচ্ছ্বাসে ও ব্যগ্রতায় এখানে পঞ্চম আয়াতে এসে তার অগোচরেই প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৩। এ আয়াতের প্রার্থনাটি অপূর্ব! এ প্রার্থনাটি এত পূর্ণ ও সার্বিক যে মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রার্থনাটি শিখানো হয়েছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-প্রাপ্তির চির আকুতিকে এ প্রার্থনাটির প্রতিটি শব্দেই রূপায়িত করা হয়েছে। এর চাইতে পূর্ণতর, উচ্চতর ও গভীরতর প্রার্থনা কল্পনাও করা যায় না। মু'মিনের মন আকুতি জানায় সরল-সুদৃঢ় পথ পাওয়ার জন্য, যে পথ সবচেয়ে কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। কখনো কখনো এমন হয় যে মানুষকে সোজা সঠিক পথটি দূর থেকে দেখিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু তাকে এগিয়ে নিয়ে সে পথে পরিচালিত করা হয় না। আর যদি পরিচালিত করাও হয় তাহলেও সে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারে না, বরং অন্য পথ ধরে ফেলে। তাই মু'মিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও এবং আমাকে সে পথে নিয়ে গিয়ে সে পথেই চালাতে থাক, যে পর্যন্ত আমি সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে না যাই। 'হেদায়াত' শব্দেই রয়েছে এ তাৎপর্য। 'হেদায়াত' শব্দের অর্থ সঠিক সোজা রাস্তা দেখানো (৯০ঃ১১), সেই রাস্তায় পৌঁছানো (২৯ঃ৭০) এবং শেষ পর্যন্ত সেই রাস্তায় চালিয়ে নেয়া (৭ঃ৪৪, মুফ্‌রাদাত এবং বাকা)। মানুষ প্রতি পদক্ষেপেই আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাই এ প্রার্থনাটি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিনিয়ত নিবেদন করা তার জন্য একান্ত জরুরী। যে পর্যন্ত আমাদের অভাব থাকবে, প্রয়োজন ও চাহিদা অপূর্ণ থাকবে এবং যে পর্যন্ত আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে না পারি, সে পর্যন্ত প্রার্থনায় রত থাকা কর্তব্য।

১৪। একজন সত্যিকারের মু'মিন বা বিশ্বাসী সত্য সোজা পথ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, কিংবা ধর্মপরায়ণতার কিছু কিছু কাজকর্ম করেই ক্ষান্ত হতে পারে না। বহু উচ্চস্তরে সে তার গন্তব্য নির্ধারণ করে এবং এমন উর্ধ্বস্তরে গিয়ে পৌঁছতে চায় যেখানে পৌঁছলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার উপরে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ্ তাআলার মনোনীতগণের উপর বর্ষিত ঐশী অনুগ্রহসমূহের দৃষ্টান্ত তার চোখে ভাসতে থাকে এবং তাকে প্রেরণা যোগায়। এতেও সে পরিতৃপ্ত হয় না। সে অবিরাম চেষ্টা করে এবং প্রার্থনাও করতে থাকে যাতে সে নিজেও পুরস্কারপ্রাপ্ত ও মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁদেরই একজন বলে গণ্য হতে পারে। এ পুরস্কারপ্রাপ্তগণ হলেন, ১. নবী, ২. সিদ্দীক, ৩. শহীদ, ৪. সালেহ্। যাঁদের উল্লেখ সূরা আন্ নিসার ৭০ আয়াতে রয়েছে। তবে প্রার্থনাকারী আল্লাহ্ তাআলাকে যখন সকাতরে ডাকে তখন তাঁর কাছে উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় প্রাণভরা মিনতি ও প্রার্থনা জানায়। তিনি প্রার্থানাকারীকে কী ধরনের অনুগ্রহ দিয়ে ভূষিত ও পুরস্কৃত করবেন এবং কে কোন্ ধরনের পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার উপরই নির্ভর করে।

১৫। সূরা ফাতেহার মাঝে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের এক অনন্য সৌন্দর্য ও অনুপম সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমার্ধ আল্লাহ্ সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ার্ধ মানুষ সম্পর্কিত। প্রথমার্ধের অংশগুলো দ্বিতীয়ার্ধের অংশগুলোর সাথে এক চমৎকার, নিগূঢ় যোগসূত্রে বাঁধা। প্রথমার্ধে সর্বগুণাধার 'আল্লাহ্' নামটির সাথে দ্বিতীয়ার্ধের 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' বাক্যটির অপূর্ব সম্পর্ক রয়েছে। যখনই এক বিশ্বাসী ভক্ত ভাবে, কত মহামহিম, কত পূত-পবিত্র, ত্রুটিবিচ্যুতিমুক্ত, সর্বগুণের পরিপূর্ণ আধার সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তখনই তার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আপনা-আপনি এ মিনতি ধ্বনিত হয়, 'প্রভু! আমরা তোমারই ইবাদত করি।' প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র গুণ 'বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক' এর সঙ্গে সম্পর্ক দ্বিতীয়ার্ধের 'আমরা তোমারই সাহায্য চাই' বাক্যটির। যখন মানুষ বুঝতে পারে, আল্লাহ্ তাআলাই তার ও বিশ্বজগতের পালনকর্তা, বর্দ্ধনকর্তা ও উন্নতিদাতা তখন সে কালবিলম্ব না করে তাঁর সাহায্যের আশ্রয় চায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, 'আমরা তোমারই সাহায্য চাই'। আল্লাহ্‌র 'আর রহমান' গুণের সাথে সম্পর্ক দ্বিতীয় অর্ধে এ প্রার্থানার–'তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর'। 'আর রহমান' এর সংক্ষিপ্ত অর্থ, 'অসীম অনুগ্রহ বর্ষণকারী, যিনি অযাচিতভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটান। আল্লাহ্‌র এ গুণ স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে মানব মনে স্বাভাবিকভাবেই সাধ জাগে, সে যেন অনিশ্চিত ও অন্ধকারময় জীবন পাড়ি দেয়ার জন্য সঠিক ও আলোক-দীপ্ত পথ পায়, যা একমাত্র 'আর রহমান'ই নবী পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে 'ওহী' দ্বারা তাকে দিয়ে থাকেন। প্রথমার্ধের 'আর্ রহীম' গুণের সাথে দ্বিতীয়ার্ধের 'তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কার দিয়েছ' বাক্যটির সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা 'আর্ রহীম'ই তাঁর যোগ্য ও উপযুক্ত বান্দাগণের ওপর পুরস্কার ও অনুগ্রহ বর্ষণ করে থাকেন। একইভাবে আমরা প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র আরেকটি গুণ জানতে পারি, তিনি 'বিচার দিবসের মালিক'। আর দ্বিতীয়ার্ধে পাই এ 'বিচার দিবসের মালিকে'র প্রতি তাঁর মানব-বান্দার মিনতিঃ "যারা 'তোমার'

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ক্রোধভাজন হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি (আমাদেরকে তাদের পথে নিও)।" মালিকের কাছে বান্দাকে কাজের হিসাব দিতে হবে, এ কথা ভাবলেই বান্দার মনে স্বভাবত ভয়ের উদ্রেক হয়, কোথায় কী ভুল ধরা পড়ে! তাই সে মালিকের কাছে প্রথম থেকেই প্রার্থনা করতে থাকে যাতে তাকে ভ্রান্তির পথ থেকে এবং ক্রোধে নিপতিত হওয়ার পথ থেকে তিনি রক্ষা করেন।

এ প্রার্থনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটা অতি স্বাভাবিকভাবে মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে। মানুষের প্রকৃতিতে আনুগত্য স্বীকারের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য দু'টি মৌলিক চালিকাশক্তি নিহিত আছে। এর একটি হলো ভালবাসা এবং অপরটি ভয়। কেউ ভালবাসায় অভিভূত হয় আর কেউবা ভয় ও ভীতির মাধ্যমে বশ মানে। ভালবাসা নিশ্চয় মহত্তর গুণ। কিন্তু এমন লোকও থাকতে পারে এবং নিশ্চয় আছে যারা ভালবাসা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাদেরকে বশে আনার একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে ভয়। সূরা ফাতেহাতে মানব-প্রকৃতির এ উভয় চালিকাশক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রথমে আল্লাহ্ তাআলার ঐ গুণবাচক নামগুলোর উল্লেখ রয়েছে যা ভালবাসাকে জাগিয়ে তোলে, যেমন 'বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী এবং বার বার কৃপাকারী।' অতঃপর ভালবাসা উদ্দীপক গুণাবলীর এ প্রান্তে গিয়ে 'বিচার দিবসের মালিক' নামটি উচ্চারিত হয়েছে। এ গুণ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সে যদি ভালবাসা দ্বারা আকর্ষিত হয়ে আত্মশুদ্ধির পথে না চলে তাহলে তাকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এভাবে 'ভয়'কেও ভালবাসার পাশাপাশি একটি চালিকাশক্তিরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার 'রহমত ও দয়ার গুণ' তাঁর অন্যান্য সব গুণের উর্ধ্বে এবং অন্যান্য সব গুণকে বেষ্টন করে আছে, তাই তাঁর এ ভীতি উৎপাদক মৌলিক গুণটিও তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের রঙে রঙ্গীণ। বস্তুত আল্লাহ্র করুণারাশি তাঁর ক্রোধকে ডিঙ্গিয়ে যায়। 'মালিক' শব্দটির মধ্যে এর আভাস পাওয়া যায় এবং আমরা স্বস্তি বোধ করি যে আমরা আইনকানুনের অন্ধ অনুসারী একজন বিচারকের সম্মুখে হাজির হচ্ছি না, বরং সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এক মালিকের সম্মুখে হাজির হচ্ছি যাঁর ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে এবং যেখানে শাস্তি দেয়া একেবারেই অপরিহার্য কেবল সেখানেই তিনি শাস্তি দিবেন।

মোট কথা, সূরা ফাতেহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরএক অফুরন্ত ভান্ডার। মাত্র সাতটি আয়াতের একটি সূরা, অথচ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি বিস্ময়কর খনি। এটা 'উম্মুল কিতাব বা গ্রন্থজননী' বলে আখ্যায়িত হয়েছে। জননী যেমন আপন গর্ভে সন্তানকে তার চেহারাসহ ধারণ করেন, তেমনি সূরা ফাতেহায় গোটা কুরআনের সারাংশ বর্ণিত রয়েছে। সর্ব প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস আল্লাহ্র নাম নিয়ে আরম্ভ করে এ সূরাটি প্রথমেই আল্লাহ্ তাআলার মৌলিক গুণাবলীর উল্লেখ করেছে, যথাঃ (১) তিনি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, (২) তিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী যিনি মানুষের জন্মের পুর্বেই মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়াই তার জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় উপায়-উপাকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিত করেছেন, (৩) তিনি বার বার কৃপাকারী, যিনি মানুষের শ্রমের উৎকৃষ্টতম ফল দেন এবং তার শ্রমের তুলনায় বহুগুণ পুরস্কার ও বার বার প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং (৪) তিনি বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিক ও অধিপতি, যাঁর কাছে প্রত্যেক মানুষকেই ইহকালীন কার্যাবলীর হিসেব দিতে হবে, তিনি দুষ্কর্মকারীকে শাস্তি দিবেন বটে, কিন্তু বিচারকের আসনে বসে নয় বরং মহান মালিকের উচ্চাসনে বসে। মালিকের শাস্তির মাঝে বান্দার প্রতি তাঁর যে স্বাভাবিক করুণা থাকে তাও একত্র হয়ে যায়। ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধন ও সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকলে মালিক বান্দাকে হয়তো ক্ষমাই করবেন। ইসলাম ধর্মমতে এটাই আল্লাহ্র পরিচিতি যা কুরআনর শুরুতেই পেশ করা হয়েছে। সেই আল্লাহ্ তাআলার মহিমা, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের যেমন কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি তাঁর করুণা, দয়াদাক্ষিণ্য ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই মানুষের হৃদয় স্বাভাবিকভাবে এ ঘোষণা দেয়, 'আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যেহেতু উচ্চ মৌলিক গুণের একক অধিকারী, সেহেতু আমি একমাত্র তাঁরই উপাসনায় নিজেকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত, কেবল প্রস্তুতই নই বরং তাঁর উপাসনার জন্য অধীরভাবে আগ্রহী।' কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা জানেন, মানুষ দুর্বল। সে ভুল করতে পারে। তাই তিনি নিজেই দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন, সে যেন তার অগ্রযাত্রার পথে সব উপায়-উপকরণ লাভের জন্য এবং সব বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য পদে পদে অবিরাম আল্লাহ্র সাহায্য চায়। সূরাটির দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের সুদূরপ্রসারী ও সর্বকল্যাণকর পূর্ণতম প্রার্থনাটি রয়েছে, যে প্রার্থনাতে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সার্বিক মঙ্গল প্রাপ্তির সরল-সুদৃঢ় পথটিতে পরিচালিত হতে চায়। সে আল্লাহ্র কাছে কাতর স্বরে মিনতি করে, সে যেন বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেই ক্লান্ত হয়ে না পড়ে বরং কৃতিত্বের সাথে আরো অগ্রসর হয়ে তাঁর মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাঁদের মতই অশেষ পুরস্কার ও অনুগ্রহে ভূষিত হয়। সে আরো অনুনয় করে, সে যেন সরল-সুদৃঢ় এ পথটিতে অবিচলভাবে চলতেই থাকে যাতে সে প্রভু-প্রতিপালক ও মালিকের নিকট থেকে নিকটতর হতে পারে। যেভাবে পূর্ববর্তীগণের অনেকেই প্রভুর নৈকট্য লাভ করেছেন সেভাবে সেও যেন নৈকট্য লাভ করতে পারে। এটাই কুরআনের উদ্বোধনী সূরার বিষয়বস্তু। এটাই নানাভাবে ও নানা আকারে গ্রন্থের সর্বত্র বার বার বলা হয়েছে।

✶ [৭ নম্বর আয়াতে বন্ধনীর মাঝে 'তোমার' শব্দটির দরুন পাঠক যেন বিভ্রান্ত না হন। কারণ 'মাগযূব' অর্থাৎ 'ক্রোধভাজন' শব্দটি দিয়ে ইহুদীরাই যে আল্লাহ্র ক্রোধভাজন হয়েছে কেবল তা বুঝায় না। এ অভিব্যক্তিটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। এটি দিয়ে কেবল আল্লাহ্র ক্রোধকেই বুঝানো হয়নি বরং মানুষ কর্তৃক তাদের ক্রোধভাজন হওয়াকেও বুঝিয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]